KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ~~[illegible]~~ ২৫২ বি/১ [illegible] [illegible] - ২, কলকাতা - ৫৫
Collection : KLMLGK	Publisher : দেবযানী মুখোপাধ্যায়
Title : অনার্য সাহিত্য (ANARJYO SHITYA)	Size : 8.5"/5.5"
Vol. & Number : 1 2 3 4 5	Year of Publication : Summer 1997 Aug 1997 Dec 1997 Dec 1998-99 May 1999
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : ?	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

অনার্য সাহিত্য

স্বাধীন লেখকদের প্রমুক্ত উচ্চারণ

কবিতা : অমিতাভ দাশগুপ্ত, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তম দাশ, অর্ধেন্দু চক্রবর্তী, নির্মল বসাক, অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়, শুভব্রত চক্রবর্তী, শুভঙ্কর দাশ, ধীমান চক্রবর্তী, পঙ্কজ মণ্ডল, শৌভিক চক্রবর্তী, অজিত রায়, চঞ্চল মুখোপাধ্যায়, অশোক দে, তমিস্রাজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীধর মুখোপাধ্যায়

নেপালী কবিতা : সুবিমল বসাকের অনুবাদ

এ সংখ্যার বিশেষ কবি সজল বন্দ্যোপাধ্যায়ের
একগুচ্ছ কবিতা ও তার কবিতার আলোচনা :
অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায় ও উত্তম দাশ

ত্রয়োদশ বর্ষ
নবপর্যায় ২.
বর্ষা ১৯৯৭

অনার্য সাহিত্য

কথা ঃ

সর্বগ্রাসী এক অবক্ষয়-প্রবাহ এ বাংলার, বিশেষতঃ কলকাতা ও সন্নিহিত অঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে করে তুলছে বিপর্যস্ত। রুচিহীনতা, মূর্খ আড়ম্বর সর্বস্বতা চূড়ান্ত স্বার্থপরায়নতা ও নিজ সংস্কৃতি বিমুখতার এই যে সাড়ম্বর প্রদর্শনী এতে সবচেয়ে বড়ো অবদান সংবাদ ও সাময়িকপত্র,ইলেকট্রনিক মিডিয়া, রাজনৈতিক দলের নীতিভ্রষ্টতা ও সরকারী আমলাদের ধ্বংসমুখী বন্ধ্যাত্ব। নয়া অর্থনীতি নামক বিষ পুরিয়াটি ভারতভূমিতে প্রবেশের সাথে সাথেই সুচিন্তিত নিশ্চয়তায় দেশীয় মূল্যবোধকে নষ্ট করে দেবার, সাহিত্য-শিল্পকে অবনমিত করে, বালখিল্যতা ও চাপল্যকে প্রশ্রয় দেবার যে চক্রান্ত শুরু হয়েছে তার প্রধান যাজ্ঞিক এ বাংলার সর্ববৃহৎ সাহিত্যগোষ্ঠী। একটি জাতিকে সংস্কৃতির দিক থেকে বামন করে রাখার, সংস্কার ও অনুশাসন ভুলিয়ে তাকে অর্থনীতির সর্বগ্রাসী যন্ত্রে একটি আপোসকামী স্ক্রু-এ পরিণত করার এ প্রচেষ্টা ঐতিহাসিক। আমেরিকা, ইউরোপের বর্জনীয় সাহিত্য ও জীবনদর্শন ঢালাও পরিবেশন ক'রে এ দেশের মানুষকে অশিক্ষিত-আলস্য ও অর্থমগ্নতায় মাতিয়ে রাখার এই স্পর্ধা উপরোক্ত দুষ্টচক্র করে চলেছে প্রতিরোধহীন। এ বিষয়ে এ বঙ্গদেশের সরকারী পৃষ্ঠপোষকতাভোগী, উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বনকারী বুদ্ধিজীবীদলের চাটুকারিকা ও উদাসীনতা অসামান্য। বস্তুতঃ যখন কোন দেশের বুদ্ধিজীবী, সঙ্গীতশিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার শাসকদল ও সরকারের উপাসকে পরিণত হয় ; যখন কোনো প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের বদলে স্বার্থচিন্তা আচ্ছন্ন করে তাদের, তখন সে দেশের সর্বনাশ যে সম্পূর্ণ তা বলার দরকার হয় না।

যে জাতি নিজেদের ইতিহাস বিস্মৃত হয়, হারিয়ে ফেলে পূর্বসুরীদের উজ্জ্বল প্রভা; যখন সে অবহেলা করে নিজ সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলি, তখন সে জাতির ধ্বংস অনিবার্য।

জাতিগত ভাবে বাঙালী সত্যই এক অতল খাদের কিনারায়। আমরা এখনো যারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে ভয় পাইনা, যারা এখনো মনে করি অতিক্ষুদ্র ক্ষেত্রে হলেও সংস্কৃতির প্রতি আমরা দায়বদ্ধ তারাই একমাত্র পারি সচেতন, সুপরিকল্পিত এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে। সময় বিশেষ নাই…

অমিতাভ দাশগুপ্ত

ঘুরে ঘুরে

আমি আজ হাওয়ার কোমর জড়িয়ে সারা রাত
ঘুরে ঘুরে গান গাইব
যেমন
ঘোড়াচোর-তরুণটিকে জড়িয়ে
বিষাদগাথা গাইত মার্‌মেইড-মেয়েটি,
সারা রাত কাঁটা দিয়ে জেগে উঠবে
আমার শরীরের পুকুরভরা হায়াসিন্থ্‌,
সারা রাত আমার তাতানো চর্বির মোমে
আলো হয়ে যাবে সমস্ত ইগ্‌লু,
আর আমি
হওয়ার কোমর জড়িয়ে
গানের মত ঘুরে ঘুরে
সারা রাত
ঘুরে ঘুরে ঘুরে.....

অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়

তখনি

হার্পুণ হয়ে ফিরে এসে দুঃখ বিঁধল আমার বুকেই....
যেখানে পাড় ভাঙা নদী ঝুলনো আছে
পাঁজর ঘেরা যাদুঘরের অলিন্দ যেখানে ধ্বসে গ্যাছে
যেখানের শীর্ষবিন্দুতে প্রেম-অপ্রেমের অজস্র বুদ্বুদ....
হার্পুণ-বেঁধা বুকের ফোকরে কোন এক সিঁদেল
কখন ঢুকেছে...কখনইবা রেখে গ্যাল রাণী উইপোকা
চারপাশ যখন ঝুরঝুর ক্ষয়ে পড়ছিল...তখনি
শেষ সাপারের ঘণ্টার বদলে মুনলাইট সোনাটার
সুস্থির আমেজে অসংখ্য ভায়োলিন বেজে উঠল
পাঁজর ঘেরা যাদুঘরের অলিন্দে...তখনি.....

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

হাফ-আখড়াই

হোঁস কাছারি চটকলের ভার মেঘলা গঙ্গা
ঢাউস একখানা ভাউলে চলেছে পিঠ চুবিয়ে—কারা যায় ?
বিদ্যুৎ চমকে উঠছে আগেরাতের গাওনার সাজবাতি।
যখন নামলুম, একা। ঘাট বলতে, নেই।
ডিঙি উলটে ঠেলে দি নলবনে।
কাদা আর রোদ্দুরে পিণ্ডি বনে আছে। বোলতার জ্বালায়
রাখতে পারে না গো গাছ পাতার আড়ু। ওপিঠের চালা কোঠা
কলাপাতে আড়াল হয়েও ঢাকতে পারে না হাড়গোড়।

চৌপ্পোকী টিপ্‌টিপ্‌ করছে বুকের নীচটাতে—কুলদেবতার,
শালগ্রামের, গরুর, পুজুরির কারও দেখা নেই। বোবার পরে বোবা
এক একটা থাম, কবুতর-ডাক গিলে খাওয়া মেঘলা দালান,
ঝাড়, সাজবাজনা হাফ-আখড়াইয়ের ছেঁড়া চুর নেশা।
পুতুপুতু করে রাখা এলোকেশী-মোহান্তের পটখানা
সিঁড়িতে গড়িয়ে পড়ল ছুট দিয়ে পোঁরিয়ে যেতে সীমানা ফটক।
অ্যাসিড আর কীটনাশার জোয়ার এসে লাগছে পায়ে। আর সেই
কালো থুম হয়ে থাকা ভার মেঘলা গঙ্গা

হোঁস কাছারি চটকলের পাশ দিয়ে বইতে তার
চৌপ্পোকী টিপ্‌টিপ্‌ করছে বুকের নীচটাতে। পিনিসের সার,
ঢাউস একখানা ভাউলে চলেছে পিঠ চুবিয়ে—কারা যায় ?
বিদ্যুৎ চমকে উঠছে আগেরাতের ধুম সাজবাতি—যেন
রঙে ভরে গেছে সুর তামাক আতর আর নেশা। নাটবেদীর 'পরে
ফ্লুটবাঁশির চাইতেও ডানা ধরা এক রূপসী সমে এসে
হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। আর হঠাৎই এগিয়ে প'ড়ে আমায় ঠার দিয়ে
দ্রুত নেমে নিবে যায় কাদাপাড় বেয়ে নলবনে !

উত্তম দাশ

এক ভারতীয় কবির ডায়েরি থেকে—৩

আমরা ভারতবর্ষ থেকে এসেছি, বাগান পেরিয়ে
আপনার বাড়ির ভেতরে পা রেখে প্রথমেই মনে হলো
এ সংবাদটা আপনাকে জানানো জরুরি, ভারতবর্ষের এই কবি
আত্মীয়তা জানাতে এসেছে আপনাকে, আপনি কি
বাংলাভাষার কথা জানেন, ভারতবর্ষের পূর্বদেশীয় ভাষা ?
যে পূর্বদেশ থেকে একদিন সেই মহামানব...
এ আমাদের কবির কথা—সর্বপর্যেব পশ্যন্তি,
ভারতবর্ষ এ কথাই তো বলে কবিদের সম্পর্কে ?

যে দেশের নামও আপনি শোনেন নি, যে ভাষার
একটি শব্দও আপনার কল্পনাকে কখনো ছুঁয়ে দেখে নি
সে দেশের সাহিত্য আধুনিক হয়ে উঠল আপনার আত্মীয়তায়
এই সংবাদটাই আপনাকে জানাতে এসেছিলাম।
বাড়ির কোথাও আপনি নেই, এই আপনার লেখার ঘর,
শোবার ঘরে সন্তানদের নিয়ে অদ্ভুত খেলায় মেতে আছেন
অ্যানে হ্যাথয়ে, আজ সোমবার, আপনি আজ আসবেন,
লণ্ডন শহরের গ্লোব থিয়েটার থেকে উপড়ে নিয়ে
আসবেন আপনার আত্মা, কালো সে মেয়েটি কি
সত্যি আপনাকে ভালোবাসে, সত্যি ; অ্যানের গৃহস্থালিতে
এ সব সংবাদের কোন চিহ্ন নেই, স্ট্রাটফোর্ডের এ বাড়ি শুধু জানে
আপনি আজ আসবেন, রান্নাঘরে কাঠকয়লায় ঝলসানো মাংসে
লেবুর রস ছড়াতে ছড়াতে অ্যানে হ্যাথয়ে শুধু আপনার কথাই
ভাবছিলেন, শুধু আপনার কথা—অর্ডেনের অরণ্যের সেই গুহাঘরের
প্রেম মনে পড়তেই কেমন চঞ্চল হয়ে উঠলেন আপনি,

ফিটনের ঘোড়াগুলো কুয়াশা ঠেলে তেমন ছুটতে পারছে না আজ।

আমি প্রাচ্যদেশীয় এক কবি, আপনার গৃহস্থালির
বিশ্রাম আমি নষ্ট করতে আসি নি,
না কোন নাটক নয়, আপনার সনেটের ভাষায়
আত্মীয়তা জানাতে এসেছি আপনাকে।

উত্তম দাশ

এক ভারতীয় কবির ডায়েরি থেকে—৪

খ্যাতির সমস্ত তন্তুজাল ছিঁড়ে আপনি বেরিয়ে এসেছেন,
সেণ্ট পল্‌স চার্চের চূড়ায় দাঁড়িয়ে জরিপ করছিলেন
উচ্চতা, লণ্ডন শহরের ঐশ্বর্য কেমন
ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল তখন, অ্যানে হ্যাথয়ের
কথা মনে হলো খুব, মেয়েদের মুখগুলো
অর্ডেনের বনভূমির সীমানা ছুঁয়ে কেমন
দ্রব হয়ে উঠল, স্ট্রাটফোর্ডের সদ্য বানানো
প্রাসাদ নয়, চাষী বাপের শ্রম থেকে
তৈরি ছোট বাড়িটাই রোমান-হিলসের
চুম্বকের মতো টানছিল আপনাকে।

মানুষের ডেসটিনি নির্দিষ্ট, আপনিই তো
বলেছিলেন, বিকেলে অ্যাভনের কাঠের
ব্রীজে দাঁড়িয়ে সে কথাই ভাবছিলেন আপনি।
ট্রিনিটি চার্চে সন্ধ্যার ধ্বনি উঠল,
লে-রেকটরকে ডাকছে বিশ্রাম-কক্ষে,
জীবন নিয়ে অনেক নাড়াচাড়া করা হলো
এবারে বিশ্রাম—অ্যানে এখন শুশ্রূষায়,
নিঃশ্বাসের শব্দ লুকিয়ে ভারতবর্ষের এই কবি
আপনাকে আত্মীয়তা জানাতে এসেছে।

অর্ধেন্দু চক্রবর্তী

মৃগনাভী

আজ অনেককিছুই বলা যাবে, মাংসের সংসার থেকে
বলা যাবে দু দণ্ডের সেই কথা, সেই নির্জন গুহাছবি,
ইলোরায় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের অবদমনের স্মৃতিকথা—

তিনদশকের ক্লান্ত ভগ্ন থেকে
চলে এসো সোনামৃগ, এসো
সহজিয়া রাত—পরস্পর জাপটে ধরি, আজ
জলের মতন দূর অব্দি খোলা সমাবেশ

চুমো দাও, রঙ করো কাদামাখা চিট
যাবো, যারা রিক্সা রেখে ভাত নিয়ে বসে
যাবো সেই মৃগনাভী রাত্রির দরজায়

শুভব্রত চক্রবর্তী

পক্ষিতত্ত্ব

ঝিনুকনেত্র, এইভাবে দিয়ে গেল গুহালিপির
নীরব সংকেত ; কিছু শিকারী অবয়ব
অস্ত্রের বদলে যারা নিয়েছে ঘুম ঘুম
হাসি ও মায়ামুখোশ। পাখি উড়ছে, পাখি
বহুদূরে ভূমিসত্রের দৃশ্যগুলি এখন শীতমাতাল

আসলে জগৎ-এ একমাত্র পাখিরাই সুখী

এবারে পালক ছড়াবে শেষরাত, তাই চারপাশে
বাজনজীবন। বাগানের অদৃশ্য প্রমাদ, চুপ নিচুস্বরে
ফাঁদ পেতে রাখে আমাদের বিষণ্ণতার ভিতর, আরও
মাখামাখি যখন ভাবীকাল, জলের ওপর
ছোপছোপ হরিণ চিহ্ন মেঘ—ফুটেছে তোখড় কলরবে

আসলে জগৎ-এ একমাত্র পাখিরাই সুখী

এসো পাখি বসো পাখি—নেশা খায়
অথচ বারবার খরা বা অতিবৃষ্টির অন্ধকারে
গা ঢাকে শষ্যখেত। এসো পাখি, উড়ে যায়
বসো পাখি, উড়ে যায় ; যেন একটা ছেঁড়া ডানা
অন্য সব গতি ফেরা সৌরপিণ্ডের খোঁজে শূন্যতা ছুঁয়েছে

আসলে একমাত্র পাখিরাই সুখী

পঙ্কজ মণ্ডল

বন্ধু

দুই পথিকের পথে নতজানু
কঠোর বালির রোদ।
উড়ে আসি মরুযানে,
মরূদ্যান ক্ষুর রক্তে বর্ণ বিবর্তিত হয়।

স্নিগ্ধ ঘুম শেষে
দুজনের জিভ খোঁজে জিভের প্রার্থিত প্রাণ।
সবুজের কাঁটা ভরা অন্ত নিয়ে
ও এখন রোমন্থনে।
গোপন অস্ত্রটি মুক্ত করি,
ওর উরু ভরে দেয় আমার গহ্বর।

শুভঙ্কর দাশ

ইচ্ছে গাছে শব্দ ঝুলে আছে—১

বৈতরণীর জন্য আছে সোনার ফুলের গল্প তার পুজো ছন্দময় হাস উড়ে গ্যাছে কবে
সেই কথা বলেনি তাকে কোনদিন হিশেবের রমণীরা জাগে প্রহর
এক দুই করে গোনে কে ঠাণ্ডার স্রোত ওই আসে উড়ে উড়ে উড়েগো
শিহরণ জ্বালা হয় এঁকেবেঁকে হাত আর ছুরি আগুনের তাপ নিচ্ছে বাথটাবে
এবং তখনও এই চিতা আর সমানে আগুন বাবা দেখে
আমায় শীর্ণ হতে হয় এ্যাত ক্ষীণ হয়ে গেছো শিরা এ্যাত বিপন্ন
হয়ে গ্যাছে ফ্রেম এই পাতা এই বাহারীর মায়া জড়ো করে
পোস্টকার্ডে আর ঈশ্বরের গুঁড়ো দম দাও এ অতিথি প্রহর
ফ্ল্যাট ভাড়া করে তোর প্রেম মাগনা হরিদাসী নিয়ে যাচ্ছে
এমন পাতায় কেগো এলে সইবে না আর খুশি হারার দায়িত্বহীন
হেঁটে চলা এবং চুপ চালাও চালাও গ্যাবরিয়েল
ধরে আনো নাড়িভুড়ী ধরে নাও ধমনীর চাপ আর খানিকটা
পাপ ছিলো কি ছিল না এইসব ভাবতে ভাবতে একটু ঠাণ্ডা
স্রোত খেতে উঠে গিয়ে দাঁড়াবো কি বাবুজন বলেছেন
এসব চলিতে পারে এসব রমণ এই গরমেও ঘাম পড়ছে ঠপ্ ঠপ্
পৌরুষ তেজ ওগো হাওয়া দস্তুর করে রাখে জিওন পদ্ধতি
এখনি আসিবে মেঘ সাজিবে অন্তর

REVELATION
CRUELLE

গাছেরা শব্দ খাওয়া ভুলে গিয়ে উগরে দেবে আলো যা লাগিয়েছো
এবং যা আবার জ্বলে জ্বালা করে
কে কাঁদিবে আরেকবার শব্দ করো
ইচ্ছে গাছে শব্দ ঝুলে আছে এসো পেড়ে পেড়ে খাই
সেইমতো জাগিবার ভার দরজা বন্ধ হলো হবে একদিন
সেই ভেবে জীবন্ত রেখেছে কে কোনদিন তার জন্য চিন্তা করি না
রাত পুইয়ে ভোর নামছে বলে আমাদের পৃথিবীর সঠিক কোথাও ভীতি উড়ানের
গায় ঢেউ দিচ্ছে হাওয়া উড়ে যাবে এমন চলবে না

তাপস চক্রবর্তীর
স্নায়বিক কবিতা-সংকলন
একটি নীল আত্মা ও অন্ধকার ঋতু
যা কবিতাপ্রেমীদের কাছে ভোরের রোদ্দুর
□ **কলকাতার হ্যামলেট** প্রকাশনা □

ধীমান চক্রবর্তী

কঙ্কালসুর

খবরের কাগজ ও সূর্যগ্রহণ থেকে
সংঘর্ষ তুলে এনে তাদের সাথে
কথা বলো একজন নাগরিক, শ্যাওলা দ্বীপ
ঠেলে নিয়ে আসে ব্যক্তিগত
প্রার্থনাছড়ের দিকে, এই ঘরের
অনেক তাক ও রুলটানা খাতায়
জানলা লাগানো ডিম্বাণুওড়না কঙ্কালসুর।

চরম নিস্তব্ধতার মধ্যে চিন্তার সুরু,
যখন খুঁজছ, প্রশ্ন ক'রছো বা অপেক্ষা,—
এসবের মধ্যে কোনও চিন্তা নেই।

প্রয়োজন না হ'লে কেউ নকল
করে না ছুরি-সুখ, নিজের মনে
স্পর্শ করা আলোদরজার থাম সেখানে
চীৎকার নেই, মোটর সাইকেল স্বপ্নে
হত্যা ক'রি ঘুমশব্দের চড়াইসমুদ্র
রূপসীড়িয়ার সম্প্রদানযাত্রায় উড়ন্ত লেন্স।

চঞ্চল মুখোপাধ্যায়

রঙ এবং না-রাত

আমার বুঝি ঘুম পেতে নেই
এক ঠ্যাঙে রাত—
উফ্ রাত
সে এক যন্ত্রনা-দ্বীপ
অন্ধকারের নীল আর কুমারী রাত্রির বিদ্রূপ হাসি

অন্ধকারে কেন এত নগ্ন লাগে নিজেকে
চারপাশ ঘিরে নাচতে থাকে নর করোটি
বিষাক্ত মদ ঝ'রে পড়তে থাকে স্নায়ু বেয়ে
উদভ্রান্ত বিছানায় ছোট হতে হতে
অনিবার্য অসৎ মুহূর্তে নিজেকে হারাই
রক্ত ঝরে পড়ে—পড়তে থাকে
সূর্য-নিশান পর্যন্ত।

নির্মল বসাক

মৃত্যুহীন

ঝর্ণা মৃত্যুতে নদী, নদী মৃত্যুতে সমুদ্র,
সমুদ্র কোথায় যাবে !
তার মৃত্যু নেই, তাই
তার বিশাল ক্রন্দন
পৃথিবী বেষ্টন করে আছে...

নিজের বিরুদ্ধে আক্রোশ
বার বার ঢেউ হয়, বার বার
ফসফরাস জ্বালে।
মাটি তাকে ঠাঁই দেয় কোলে,
মাটি তাকে দুহাত বাড়িয়ে
বুকে তুলে নেয়।

মাটি, এখনো আসঙ্গ পিপাসু
মাটি জানে, তার মৃত্যু আছে...

শৌভিক চক্রবর্তী

ফসিল পৃথিবী

যে তুমি তুমি নও
সেই তুমি গান গাও অতিযাপনের ব্রতগাথা
সেই সুর শিমুল তুলোর মতো পাঁজরা ফাটিয়ে
উড়ে যায় সৌর আকাশে
সেখানে সীমান্ত নেই কাঁটাতার কলঙ্কের
নেই চেকপোষ্ট
অনিকেত নক্ষত্রের দেশে ছাড়পত্রহীন গতায়াত
বাতাসের কানে কানে বাষ্প মেঘেরা
শোনে তার জনপদগীতি
বিগত জন্মের স্মৃতি জল হ'য়ে ঝরে
তবু ফসিল পৃথিবী থেকে সংকেত মেলেনা কোনও
শুধু কিছু অচেনা চিহ্নবীজ অপেক্ষায় থাকে
যদি কেউ আসে
ভিন্ন গ্যালাক্সী থেকে যদি কেউ
পথ ভুলে নামে
যদি ফের অহল্যা প্রান্তর জেগে ওঠে।

অজিত রায়

কবিতার শুকনো খোলস

সমবেত হাততালি ধোঁয়ার ভেতর, ধরাশায়ী শব্দ আর
আড্ডাবাজ বন্ধুদের কথা মনে পড়ে বেশি করে—
শ্রীধর সোফিওর নীলাঞ্জন তাপস আর ঈশিতা...

আর, চোখে পড়ে
কাঁটাঝোপে, বাবলাগাছের ডালে
ঝুলে আছে কবিতার হাড়
মোরাম-বিছানো রাস্তায়
সাইকেলের ক্যারিয়ারে বসে ফিরে যাচ্ছে শব্দের ভাই।

ভালোবাসার গর্ভে ছিল দো-ফসলী চাঁদ
পোষা সন্ধ্যায় পুড়ে যেত পলিথিন রাত
বস্তিতে মল ও বিষ্ঠার নূপুর ফেলে বেরিয়ে যায়
পেট রোগা গদ্য।
অথচ,
লেখার টেবিলে শুধু পড়ে থাকে
মরা কবিতার শুকনো খোলস।

অথবা, কবিতাকে জ্যান্ত ভেবে
একদিন ডাস্টবিন থেকে আনলুম তুলে,
পরদিন খুব ভোরে উঠে ছুটে গিয়ে
সন্তর্পণে ঢাকনা তুলে দেখি ওমা,
পড়ে আছে কবিতার শুকনো খোলস।

শুভব্রত চক্রবর্তীর বই! কাব্যগ্রন্থ!

বারবারই তো আমাদের উৎসাহিত করে এ খবর এবং হতাশ করে।
পাঠক নিশ্চিন্ত থাকুন, শুভব্রতর কবিতাবই খুব শীঘ্রই

অশোক দে

হিমায়ন লাইলাক

লাইলাক রঙা সোয়েট সার্ট পরা সদ্য তরুণ
উদ্গত উচ্ছ্বাস ও ফিকে লোহিত আবেগ দাঁতে দাঁত ঠোঁটে
ঠোঁট চেপে সামলাচ্ছিলো প্রাণপণ
গরাদহীন জানলায় ফিরে যাচ্ছিলো বাদামী বায়ুরা।

কিয়ৎকাল আগেই সে অগ্নিস্রাবী বটিকা খেতে
চেয়েছিলো; পাশে মাকড়শা উদ্বাহু হয়ে জাল বুনে
দিলো চারধারে!

লোমশ মাকড়শা

রোয়াঁ রোয়াঁ ওঠা
চটচটে আঠালো রসের তরুণী মাকড়শারা
লাইলাক বর্ণের তন্তুময় পরিধিকে ঢেকে দিলো।
সে উঠে দাঁড়ায়। জানলার ভারী পাল্লা ঠেলে
প্রতিস্থাপন করলো তাঁর তরুণ গ্রীবা।

বাতাস কিঞ্চিৎ লঘু তখন গোলাপী আভার
কিশোরী পালকেরা উড়ছে
বুলিয়ে দিচ্ছে
অপাঙ্গে

অন্তকোষে

যার লেখায় প্রকৃতির ধারাপাত কবিতার সজলতা, সেই
সলিল চক্রবর্তীর চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ
মহেঞ্জোদাড়োর দিকে
□ **নয়াপ্রকাশ** □

তমিস্রাঞ্জিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

এক টুকরো দ্যাখা

যা ছিলো যেখানে ঠিক সেইখানে সব চুপ পড়ে আছে
কুঁজো, গ্লাস, বন্ধ দেয়াল-ঘড়ি, রোদ চশমা
ও ছাদে লেগে কিছু অন্ধকার
যা থাকার নিঃশব্দে থাকে
টকটকে লাল রক্ত শিরার টানেলে
জিভের গোড়ায় কিছু জড় শব্দ চেতনা রহিত
ভর করে সময়ের কালচক্রে অহেতুক জীবনযাপন
একমুঠো ঝরে পড়া জোনাকির মত চুপচাপ
পড়ে আছে প্রান্তিক গলাকাটা ভৌতিক ছায়া নির্জনে
অর্থাৎ যা ছিলো যেখানে ঠিক সেইখানে সব চুপ পড়ে আছে

ধৃতিমান ধরে আছে অনাদর, উপেক্ষা জীবনের
নখে বিষ মেখে নিয়ে সুযোগ খুঁজছে দাম্ভিক
যা ছিলো যেখানে ঠিক সেইখানে এখনও আছে
বর্তুল পৃথিবীর সবই স্থির অপার্থিবতায়

প্রজ্ঞাবান এক লেখকের
বাস্তব / কুহক, পার্থিব / অতীন্দ্রিয় অন্বেষণ
গল্পগ্রন্থ : **নিপা, একদিন অন্যসময়**
শ্রীধর মুখোপাধ্যায়
□ গ্রাফিতি □

শ্রীধর মুখোপাধ্যায়

মৎস্যকুমারী

এঞ্জেল ও কিসিংগোরামির সান্নিধ্যে, আমার এ্যাকোরিয়ামে
এক মৎস্যকন্যা আছে।
পোড়া গ্যাসোলিন বিকেল যখন থাক করে দেয় বোধ ও অনুধ্যান
অথবা চটচটে রাত্রি যখন শৌচাগার ক্লেদ ঢেলে দেয় মাথার ওপর
তখন জিলাটিন স্টিকের মত জ্বলে ওঠার অলক্ষণ-এ
আমি আপ্রাণ সৎ থাকার চেষ্টা করি
কারণ আমি জানি : শুদ্ধ চিন্তা তার আহার্য ; সুস্নাত ঘুম
তার, শুভ সংস্কার

গূঢ় প্রার্থনায় সে চায় অমৃতবৃষ্টিতে ধুয়ে যাক বসুন্ধরা,
মানুষী উঠোন।
আশিহীন তার উপরিভাগ থেকে ঝরে মধু।
জৈব তাড়না তার শুধু ভালবেসে যাওয়া

সভ্যতার সোমত্ত এক মেয়েশরীর নবরন্ধ্রে শুষে নেয় অস্তিত্ব, মেধাপ্রজ্ঞা সব।
মহাজাগতিক রশ্মি শুকিয়ে দেয় ত্বকের সাফল্য। কর্টেক্সে নেচে বেড়ায়
রাসায়নিক কুটনীতির পাপ।
অর্থের আবিল নীতি থেঁতলে দেয় প্রস্টেট্, ফাড়িং-উল্লাস আর
অবমানুষ হ'তে হ'তে ইন্টারনেটে : যাবজ্জীবৎ সুখম্ জীবেৎ,
ঋতুহীন রিপু প্রকল্পনা...

কে আমার ঘরের দেয়ালে আঁকে ছবি ? তন্দ্রা ভ'রে ওঠে
রোজ ; কার মন্দ্রগানে ?
কে কাঁদে মানুষীপ্রবাসে, অমিত, সারাদিন সারারাত ?

রঙীন মাছ নয় কাঁচের এ্যাকোরিয়াম জুড়ে এক শতদল :
আমি তার প্রভাময় পাপড়ি দেখি ; দেখি রেণু, অনন্ত মৃণাল।
ঘূর্ণাবর্ত পেরিয়ে মূল প্রবিষ্ট যার কন্যার নাভীতে।
দশরঙা রামধনু এক ভেসে ওঠে জলের হৃদয়ে,
প্রাকৃত ছন্দে ওড়ে রতিকণা, প্রজাপতিদল।

মৎস্যকুমারী, আমার অবচেতন

সজল বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের সময়ের এক বিশিষ্ট কবি। তিনি তাঁর কবিতার যে শরীর তৈরী করেছেন বহু অধ্যাবসায়ে তা বাংলা কাব্যে এক অসামান্য সংযোজন। শিক্ষিত, ভদ্র, সুগায়ক, রুচিবান এই কবি কবিতাকে কোনোভাবেই পণ্য করে তোলার বিপক্ষে। প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানবিরোধী কোন তাঁবুতেই তাঁকে পাওয়া যায় না। কবিতা, সুর, রং নিয়ে তিনি থাকেন আত্মার নিজস্ব নির্জনতায়। অতি সজ্জন এবং ম্যানিপুলেটার ও দলবাজ নয় বলে এবং নিজের বাদ্যযন্ত্র নিজেই বাজান না বলে তার কবিতা / কাব্যগ্রন্থের প্রচার কম। খুবই। এ আমাদের লজ্জা। এ সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর কবিতাগুলি সবই তাঁর পূর্ব-প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলি থেকে নেওয়া। বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত, এই কবিতার কোলাজ বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের পাঠক / লেখকদের কথা মাথায় রেখেই মুদ্রিত হল। তাঁর কবিতা/তাঁর ওপর দুটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন তাঁর দুই প্রিয়জন, কবি উত্তম দাশ ও অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়। কবিতা বুঝতে হলে কবিকে পড়া দরকার। দুই কবি তাঁদের অন্তরঙ্গ কবির কথা তাই বলেছেন চমৎকার উষ্ণতায়।

কবিতাগুচ্ছ

সজল বন্দ্যোপাধ্যায়

□ তৃষ্ণা, আমার তরী

ছোট্ট আমার তরী।
আরোহী তা'তে বাইশটি অপ্সরী।
উড়িয়ে দিয়ে পীনোদ্ধত পাল,
জানিয়ে দিল যাত্রার প্রাক্কাল।
ছোট্ট আমার তরী।
আরোহী তা'তে বাইশটি অপ্সরী।
তরতরিয়ে চল্ল ছুটে স্রোতে,
যেন বা ঠিক একটি পদ্মকুঁড়ি,
হিংসুটে সেই চাঁদের দেশের বুড়ি
দেখছে তাকে আকাশ-জানলা হতে।
ছোট্ট আমার তরী,
আরোহী তাতে বাইশটি অপ্সরী।
চতুর্দিকে থৈ থৈ থৈ জল,
ক্ষিপ্র দাঁড়ের শব্দ ছলাৎছল্,
জেগে উঠবে সুপ্ত অজগর,
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ছড়িয়ে পড়বে রুদ্ধ শিসের স্বর।
ছোট্ট আমার তরী,
আরোহী তা'তে বাইশ যাদুকরী।
আমি তাদের খেলার পুতুলিকা।
তরীটা ঠিক আমারই পিপাসার
দৃশ্য ছবি এবং পালে আমারই অহমিকা,
মন্ত্রবলে ছুটছে চারিধার,
হাওয়ার টানে ছিঁড়ছে দড়াদড়ি।

তৃষ্ণা, আমার তরী,
ছুটছে আর হাসছে তা'তে
বাইশটি অপ্সরী।

□ নগ্নতা

দুটি ফুটকি
দুটি তারা
দুটি ফুল
দুটি ঢেউ
দুটি ফুটকি
আর
খানিকটা কালো আকাশ

□ চুম্বন

সবুজ পরদাটা
নড়ছে
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
পা য়ে র ছা প
আসছে যাচ্ছে বলছে

একটা সিগারেটের প্যাকেট
দুটো সিগারেটের প্যাকেট
কাপ ডিশ
চামচ চিনি দুধ শব্দ
সিগার পাইপ গন্ধ
টেবিল চেয়ার
পা মেঝে জুতো
শার্শী বৃষ্টি
আর হঠাৎ ঝড়
দপ্ করে একটা দেশলাইয়ের কাঠি
জ্বলল
আর নিভল

□ অভিমান

একটার পর একটা সিগারেট
মাথায় বালিশ
পায়ে বালিশ
এপাশ ওপাশ
ঘড়ির শব্দ
পুরোনো কথা
বাক্সের ভরা শব্দ

কিন্তু
রাত অনেক রাত
কিন্তু
ভোর
ঘড়ির শব্দ
ভোর
তবুও…

□ পিকাসোর নীল জামা

অনেকবার
নিজের ছায়ায়
নীল আঙুল তুলে
চাঁদের ওপর মুকুট রেখে
মন্দির ছুঁয়ে
পাহাড় ডিঙিয়ে
নদী পেরিয়ে
পথ হারিয়ে
বুকের ওপর জলের ফোঁটায়
নীল আঙুল তুলে
অনেকবার নৌকোটাকে
ডাকতে ডাকতে
পার্কস্ট্রীটের ভিড়ে
নাকতলায় ভরদুপুরে
নীল আগুনে
অনেকবার
আমার পাঞ্জাবীর মধ্যে
পিকাসোর নীল জামা

□ ছোঁয়া

সবাই অপেক্ষা করছে
কখন জল এসে পা ছুঁয়ে যাবে

হাওয়া দেয়, পদ্মপাতা কাঁপে
জল নড়ে, শিশু টালমাটাল করে

সবাই দাঁড়িয়ে থাকে
জল এসে পা ছুঁয়ে যাবে

যারা ফিরে যায়
তাদের ঘুমে জলের শব্দ
যারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়ে
তাদের গায়ে জলের হাওয়া
যারা জেগে দাঁড়িয়ে থাকে
তাদের চোখে জলের ছবি

সবাই অপেক্ষা করে
জল এসে পা ছুঁয়ে যাবে

বক এসে ঠোঁট দিয়ে জল ছুঁয়ে যায়
মাছরাঙা জলে মুখ ডুবিয়ে নেয়
গাছের পাতা জলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে
দুটো মাছ জলের মধ্যে জল হয়ে যায়

সবাই জেগে থাকে
জল এসে পা ছুঁয়ে যাবে
রাতে ছায়ায় পা দেখা যায় না

রাতে জল ছায়া হয়ে যায়
রাতে চোখে ছায়া নামে
রাতে শরীর ছায়ায় ডুবে যায়

সবাই অপেক্ষা করে
জল এসে পা ছুঁয়ে যাবে

তারপর সকাল হয়
ছায়া জলে নেমে যায়
ভিজে মাটির ওপর পায়ের ছাপ থাকে

কখন জল এসে পা ছুঁয়ে চলে যায়

সবাই জেগে আছে
কখন জল এসে পা ঝুঁয়ে যাবে

□ এখন বিকেল

টেরিলিন টিরিকটন খদ্দর বুকপকেট পাশপকেট
বুকে কলম মাথায় কাঁটা পান লিপস্টিক সিগারেট

না, ভেবেছিলুম হাডসন স্টুডিবেকার
না, অ্যামবাসাডর মার্ক টু
শুধু অ্যামবাসাডর আর অ্যামবাসাডর

ওপরে কাক গাছের তলায় দাঁড়িয়ো না
তাড়াতাড়ি সরে এলাম
তারপর
রুমাঝুমা রুমাঝুম রুমাঝুম

To seat 36
Pro. Calcutta Automobile Co.,
9 Panditia Rd.
Calcutta-29

থাম পঞ্চাশটা প্যান্ট দশটা ব্লাউজ ভেতরের জামা
পুলিশের লম্বা হাত
গাড়ী গাড়ী ঠেলা টেম্পো বাস মানুষ গরু
পাঁচটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকী
চিৎপুর রোড
পাঁচটা দুয়ের ব্যান্ডেল লোকাল
রুমাঝুমা রুমাঝুম রুমাঝুমা রুমাঝুম

□ চাঁদের আলোয়

মাঠের ওপর তাদের নীল ঘোড়াগুলো এসে থামল। ঘোড়ার পিঠ থেকে তারা একে একে নামল। আদের হাতে দুধের সাদা পাত্র। হাসিতে কেঁপে উঠলো। চলকে উঠলো। তারপর মেঘের ডানা নাড়তে নাড়তে ঘোড়াগুলো আস্তে আস্তে ফিরে গেল। বাঁশের পাতায় ফেলে রেখে গেল খসখস শব্দ।

তারা দেশের সমস্ত পোষাক খুলে ফেলল। পেঁজা বরফের মত নরম শরীরে তারা লাগাল ফোঁটা ফোঁটা দুধ। তাহিতির মেয়েদের শরীরও বোধহয় এত নরম নয়।

তাদের স্নানের গন্ধে আমার শরীরে স্বপ্নের মত হাওয়া এসে স্পর্শ করল। তাদের স্তনের বোঁটা জোনাকির মত চিকচিক করছে। মনে হল দুধের রঙে ভিজে যাবে, সাদা হয়ে যাবে সারা মাঠ।

দেখলাম, আবার মেঘের ডানা নাড়তে নাড়তে সেই নীল ঘোড়াগুলো আসছে। ইচ্ছে হল

যাই
বুকে
হাত রাখি

ভিজে মাঠে হেঁটে বেড়াই।

তাদের স্নান সারা হল। তারা ফিরে গেল। মাঠে দাঁড়িয়ে দেখলাম, ঠাণ্ডার আমেজ ছাড়া কিছুই তারা রেখে যায় নি। যাবার সময় স্তনের বোঁটায় শুষে নিয়ে গেছে সমস্ত দুধ। ফেলে গেছে শুধু শিশিরের মত টলটলে দুধের পাত্রগুলো।

অহং-এর সীমা পেরিয়ে অন্তর্চেতনার স্রোত, মগ্নচৈতন্য

উত্তম দাশ

সজল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৪২ সালে। তাঁর প্রথম কবিতার বই 'তৃষ্ণা আমার তরী' বেরিয়েছে ১৯৬৬ তে। প্রায় এগার বছরের দীর্ঘ ব্যবধানে দ্বিতীয় কবিতার বই স্বপ্নে উপকূলে' বেরুল ১৯৭৭ সালে। এর পরে 'পিকাসোর নীল জামা' ১৯৭৯, 'মিড়' ১৯৮১, 'রায়ার পাইপ' ১৯৮৪ এবং ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত হলো 'ভ্রমণ'। আবার দীর্ঘ নীরবতা। পূর্বে প্রকাশিত ছয়টি বই থেকে বেছে নিয়ে এবং অগ্রন্থিত কবিতার সমবায়ে ১৯৯৪তে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর নির্বাচিত কবিতা। সজলের যা মুদ্রিত কবিতার সংখ্যা তা নিয়ে অনায়াসে দশ ফর্মার আয়তনে সমগ্র কবিতা সংগ্রহ বের করা যায়। ষাটের শুরুতে কবিতা লেখা শুরু করলেও মাঝে অনেকদিন সজল কবিতার বাইরে ছিলেন। ষাটের মাঝামাঝি 'শ্রুতি' আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিয়েও তিনি কখনো বহুপ্রসূ হয়ে উঠতে পারেন নি। তাঁর কবিতার মেজাজই হলো বহু লেখার বিরোধী।

সজলের প্রথম কবিতার বই 'তৃষ্ণা আমার তরী'তে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষানবিশীর সমস্ত ছাপই ধরা রয়েছে। সমকালীন কবিতার স্বপ্নালুতা, ঈষৎ রোমান্টিক ভাবাবেগ, পঞ্চাশের কবিতার গঠনশৈলী, চারপাশ থেকে সংগৃহীত নানা জীবনভাবনা ধরা পড়েছে এ গ্রন্থের কবিতায়। মিলের ব্যবহার এবং মিল খুঁজে ফেরা, ছোট কবিতায় সনেটের শরীর নির্মাণ, সমকালীন এ সব কবিতার গঠনগত রূপ বা বৈভব সজল তুলে ধরেছেন তাঁর কবিতায়। কিন্তু এর মধ্যে তাঁর যে নিজস্বতা স্বতঃপ্রকাশিত তা হলো তাঁর মানস-গঠনের সজীবতা। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থে সজল একেবারে পরিবর্তিত। সমিল কবিতা একেবারে বর্জিত, প্রথাগত আঙ্গিক বা গঠনবিন্যাস থোলস ছাড়ার মতো পরিত্যক্ত এবং কবিতার নিজস্ব ভাষা প্রকরণ এই সময়ের মধ্যে সজল নিজের মতো গড়ে নিয়েছেন। তরুণ বয়সের যে কবি-ভাবাবেগ সজল কখনো বর্জন করতে পারেন নি, তার মধ্যে অন্যতম, হয়তো বা শ্রেষ্ঠ হলো রবীন্দ্রনাথের গানের প্রতি ভালোবাসা। তাঁর নিজস্ব সঙ্গীতশিক্ষা হয়তো এ কার্যকারণে যুক্ত। এবং অনিবার্যভাবে তাঁর নিজস্ব মানস-গঠনও।

'শ্রুতি' পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৫ সালে। ১৪টি সংখ্যা প্রকাশের পরে ১৯৭১-এ পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। মূলত এ পত্রিকা কেন্দ্র করেই সজলের কবিতার রূপরীতির আমূল পরিবর্তন, বলা যায় একেবারে গোত্রান্তর। পত্রিকার নাম 'শ্রুতি' হলেও, এখানে যে কবিতার আন্দোলন গড়ে উঠল তা মূলত কবিতার দৃশ্যরূপের। কিন্তু শব্দের ধ্বনিরূপের কথা যে এধারার কবিরা ভাবেন নি তাও নয়, তাঁদের কবিতার সংহতি, শব্দের ধ্বনিস্পন্দের প্রতি গুরুত্ব আরোপ এ কথাই ভাবায় যে শব্দের ধ্বনিরূপ ও দৃশ্যরূপের একটা সমন্বয় হয়তো তাঁরা চেয়েছিলেন।

ফরাসি দেশে আধুনিক কবিতা আন্দোলন পর্বে শব্দের ধ্বনিগুণের ওপর অসীম গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। সেই সূত্রে কবিরা খুঁজে ফিরছিলেন শব্দের ধ্বনিস্পন্দ ও সংগীতধর্ম। কবিতা এক সময়ে ছিল সংগীতের সহযোগী। ছাপাখানা আবিষ্কারের পর থেকেই কবিতার গলার থেকে সুর সরিয়ে দিতে চেয়েছে। কিন্তু আমাদের ভাষায় শ্রেষ্ঠ কবিই হলেন গানের জগতের মানুষ। এবং প্রবীণ কবিদের অনেকের সঙ্গেই গানের যোগাযোগ গভীর। কিন্তু এ কারণে নয়, ভাষাগত কারণে বাংলা শব্দ থেকে সংস্কৃত শব্দের ধ্বনিস্পন্দের হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যকে ভিন্ন প্রেক্ষিতে বাঙালি কবিরা উদ্ধার করতে চাইলেন। মধুসূদনের মতো তৎসম ও যুক্তাক্ষর সমৃদ্ধ শব্দ ব্যবহারে এই ধ্বনিস্পন্দের অন্বেষণ নয়, কবিতায় ব্যবহৃত যে কোন শব্দের মধ্যেই ধ্বনিসংগীতকে মেলে ধরার প্রবণতা থেকে শ্রুতি পর্বে যে কাজটি কবিরা করতে চাইলেন, সেটা হলো শব্দের চিত্রধর্মিতার সঙ্গে ধ্বনিস্পন্দের সমাহার ঘটিয়ে ধ্বনির একটা চিত্ররূপ নির্মাণ করা। একাজে সজল যথেষ্ট সফল। এবং এ কারণেই তাঁর প্রথম কবিতার বই 'তৃষ্ণা আমার তরী'র সঙ্গে 'স্বপ্নে উপকূলের' পার্থক্য যুগান্তের। এই ঐতিহাসিক রূপান্তরের পরিষ্কার একটি ছবি ধরা আছে 'শ্রুতি' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায়। সজলের কবিতায় প্রাথমিক আড়ষ্টতা 'শ্রুতির'-র প্রথম চার সংখ্যায় প্রকাশিত কবিতাতেই ছিল, পঞ্চম সংখ্যায় 'মুখোমুখি' কবিতা থেকে স্বকীয়তায় প্রতিষ্ঠা পেলেন তিনি। এই অর্থে সজল শ্রুতি আন্দোলনের সৃষ্টি।

কবিব্যক্তিত্বের প্রাথমিক শর্ত নিজস্ব ভাষা আবিষ্কার। নিজস্ব ভাষা বলতে সময়ের ভাষা থেকে নিজের ভাষা আলাদা করে নেওয়া। বাংলা কবিতায় তিরিশের দশক থেকে ভাষার কৃত্রিমতা পরিহারের সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়, ক্রমাগত যা বেগবান হয়েছে এবং অত্যন্ত দ্রুততায় স্বাভাবিক উচ্চারণ পদ্ধতির

কাছাকাছি এসেছে। বাক্‌ছন্দ কবিতার বাহন হয়েছে, বিশেষ করে পঞ্চাশ-ষাটের কবিতায়। কিন্তু তার মধ্যেও যে সজল বিশিষ্ট তার মুখ্য কারণ সজলের নিজস্ব কবিভাষা নির্মিত হয়েছে শুধু যুগ প্রতিবেশ বা কবিতার ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তন ধারা থেকে নয়, তাঁর চরিত্রগত কতগুলি মৌল উপাদান থেকে। তাঁর ভাষার চিত্রময়তা বা ইঙ্গিত প্রবণতা নিঃসন্দেহে শ্রুতি আন্দোলনের দান। কিন্তু ভাষার মধ্যে সুরকে লগ্ন করে দেওয়া সজলের পক্ষে সহজ হয়েছে পারিবারিক সংগীতের ঐতিহ্যকে নিজের মধ্যে স্বাভাবিক গতিপথে স্থাপন করায়। প্রথম জীবনে দেবব্রত বিশ্বাসের গানের প্রতি তাঁর মুগ্ধতা এবং রবীন্দ্রনাথের গানকে জীবনের চালিকা শক্তি হিসাবে ভাবনার মধ্যে তাঁর যে আন্তরিকতা সেখানেও ক্রিয়াশীল তাঁর মধ্যে বাহিত পারিবারিক সুরের ঐতিহ্য। সজলের ভাষা তাঁর সমকালের মধ্যে আলাদা হয়ে নিজস্ব ব্যক্তিত্বে চিহ্নিত হয় সুরের স্বাভাবিক স্পন্দে। ভাষার সংগীতধর্ম সুরেলা কোন ব্যাপার নয়। সুর এক স্পন্দনশীল প্রক্রিয়া, যা ভাষার মধ্যে গতির সঞ্চার করে। এই অর্থেই সজলের কবিতার ভাষা সংগীত-ধর্মে সমৃদ্ধ।

অন্য পক্ষে তাঁর ভাষায় যে সংলাপাত্মক ভঙ্গিটি ধরা পড়ে তার কারণ নিশ্চিতই ভাবকে জীবনের প্রবাহে স্থাপনা। মুখের ভাষা বললে সত্যি কিছুই বোঝায় না, যদি না সে ভাষা জীবনের মধ্যে স্থাপিত হয়। 'শ্রুতি' আন্দোলনের মধ্য পর্ব থেকে সজল এ ভাষার মধ্যে চলে এসেছেন। কবিতা পাঠে বা শব্দের উচ্চারণে টের পাওয়া যায় জীবনের প্রবাহ। ভাষার এই সজীবতা বিভিন্নভাবেই তৈরি হয়। সজল এই সজীবতাকে স্বকীয়তায় এনেছেন অন্য একটি ভঙ্গিতে। তাঁর কবিতার ভাষা অর্থের সম্ভাবনা তৈরি করে মাত্র, নির্মাণের কাছাকাছি এনে পাঠককে ছেড়ে দেয় তাঁর স্বাধীনসত্তায় বিষয়টি বুঝে নিতে। সেখানে পাঠকও সৃষ্টিশীল। এভাবেই কবি ও পাঠক পরস্পরের সাপেক্ষ হয়ে ওঠেন। তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'স্বপ্নে উপকূলে'-তে 'নীরবতা' বলে একটি ছোট কবিতা আছে। উদ্ধার করি বোঝা যাবে তাঁর ভাষার নিহিত গুণগুলি বা প্রবণতা কি ভাবে সেখানে সংহতি পেয়েছে।

> কুঁজোর মধ্যে জল
> আলনায় জামাকাপড়
> আলমারীতে বই
> বিছানার ওপর চাদর
> আর.....

এখানে কতগুলো বস্তুর বর্ণনাই নয় কিংবা নয় কিছু দৃশ্যরচনা। একটি শব্দ কিভাবে অন্য শব্দকে আকর্ষণ করে আনছে, সংগীতের ঐক্য এখানে কিভাবে

কার্যকর তার ধারণা পাওয়া যাবে শব্দের চলন থেকে। শব্দগুলো পরপর ব্যবহৃত হয়ে পাঠককে নিয়ে যাচ্ছে এক নির্মিতির দিকে। কল্পনার অবয়বটি তৈরি করে সজল তাকে সুরের গতিস্পন্দে পৌঁছে দিয়েছেন পাঠকের মস্তিষ্কে, তারপরের কাজটুকু পাঠকের। অনুভবের, নির্মাণের বা আবিষ্কারের। সজলের কবিতার ভাষা এই আবিষ্কারের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় পাঠককে।

কিন্তু কি সেই আবিষ্কার? এবং কেন সেই আবিষ্কার? 'স্বপ্নে উপকূলে' গ্রন্থের নাম-কবিতায় সজল বলছেন এভাবে—

গীর্জার ঘণ্টা বাজলে নিজের মধ্যে সর্বস্বান্তের মত খুঁজে বেড়াই।
গান গুনলেই বাক্সের সমস্ত কিছু ওলটপালট হয়ে যায়।

গীর্জার ঘণ্টা আর গান প্রায় সমার্থক। সুরের দ্বিবিধ বিন্যাস। কিন্তু গীর্জার মধ্যে একজন 'তুমি' আছেন 'রক্তের দেওয়াল জুড়ে' যিনি শুভ অনুভবে নিয়ে যান জগতের সকলকে, সবকিছুকে। তাঁকে আশ্রয় করে, গানের ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁকে লগ্ন করে নিজের মধ্যে সর্বস্বান্তের মতো যে খোঁজ তৈরি করেন সজল, তা তাকে নিয়ে যায় এক 'আত্মের' ঘেরাটোপে যেখানে 'কিছু বলব ভাবতে ভাবতে শেষে যা কিছু বলি সব আমারই কথা'।

এই আত্ম থেকে তৈরি হয় অন্বেষণ, খুঁজে ফেরা। এ কারণে সজলের অভিজ্ঞতার জগৎ বাইরে থেকে বিস্তারিত না হয়ে ক্রমাগত অভ্যন্তর মুখী হয়ে ওঠে। দৃশ্যময় জগতের মধ্যে নিজের অস্তিত্বে ধৃত ছবির মধ্য দিয়ে চেতন জগৎ-কে বুঝে নিতে নিতেই সজল চলে যান অন্তর্চেতনার জগতে। সেখানেও অন্বেষণ। কিন্তু বস্তুগত ভাবে কোন অর্জন কোথাও নেই। এ যেন নিজেকে বুঝতে বুঝতে নিজের মধ্যে অনন্ত এক অন্বেষণ। প্রসঙ্গত 'পিকাসোর নীল জামা' গ্রন্থের 'উপস্থিতি' কবিতার ছবিগুলি লক্ষ্য করি।

কলঘরে জল ঢালার শব্দ—
তারপর
বারান্দায় স্লিপারের শব্দ—
তারপর
শোবার ঘরে পাউডারের গন্ধ

এই ভাবে সজল ছবি থেকে ছবিতে, এক ছবির টানে অন্য ছবি নির্মাণ করতে করতে জীবনের এক আবহে নিয়ে চলেন পাঠককে।.....পাঠক এক একটি ছবি

স্পর্শ করছে আর ক্রমাগত জীবনের মধ্যে রোপণ করছে নিজেকে। কিন্তু তারপরেই সজল যখন লেখেন—

সব একসঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে
ঝর্ণার শব্দে ঘুম আসছে

পাঠককে নিয়ে সজল পাড়ি দেন চেতনজগৎ থেকে অন্তর্চেতনার জগতে। কিন্তু কি আছে সেখানে। পৃথিবীর সব দার্শনিকই সে অন্বেষণ করেছেন। একজন কবির কাছে খোঁজটাই যথেষ্ট। প্রাপ্তি এক বৈষয়িক অর্জন, কবির লুব্ধতা সেখানে নয়। কখনো লুব্ধ হলে কবিকেও দর্শন ঘিরে ধরে। যেমন সজলের 'মিড়'-এর অনেক টুকরো লেখাতেই তা ঘটেছে। ক্ষুদ্র কবিতা কবির পরীক্ষাস্থল। ভেবে চিন্তে ও-বস্তু বানাতে গেলে বারে বারে স্খলন। টুকরো অনুভবের ছড়ানো এ গ্রন্থের অণু কবিতাগুলি সজলের অবসর যাপন আর দার্শনিক প্রতীতির ফসল। চেতন অচেতন জগতের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে বিচিত্র ভাবনার মুখোমুখি পাঠক এখানে।

কিন্তু সজল একেবারে সংহত ও একাগ্র হয়ে 'স্বপ্নে উপকূলের' আত্মকে নিজস্ব মতে পুরো একটা অবয়বে ধরলেন 'রায়ার পাইপ'-এ। পরিপার্শ্ব এখানে আরো বিস্তৃত এবং গভীর। ফলত এখানে চেতন অচেতন আলো ছায়ার স্তর ছুঁয়ে ছুঁয়ে তিনি একটা স্থির বিন্দুতে মেলে ধরেন নিজেকে। বলেন—

নিজের ছায়া সমস্তটাই নিজের—
অন্য কিছু রাখাই যাচ্ছে না—

এ যেমন সজলের প্রাপ্তির উৎস, তেমনি সংকটেরও কেন্দ্র। আধুনিক মানুষের হয়তো এটা নিয়তিও। কিন্তু 'ভ্রমণ' নামের শেষ প্রকাশিত গ্রন্থে নিবারিত হয়েছে যেমন তাঁর মানসভ্রমণ, তেমনি তাঁর কবিজীবনের পরিণতির দিকচিহ্নও এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দেখা যাবে শব্দানুষঙ্গে কিভাবে তৈরি হচ্ছে দৃশ্যানুষঙ্গ, তা থেকে বিষয়ের অবয়ব গড়ে তুলছে চেতনার ভিন্ন ভিন্ন স্তর। অন্তর্চেতনার স্রোত বিচিত্র মুখ থেকে আহরণ করছে জীবনের আবহ, অস্ফুট অপ্রকাশ। কিন্তু প্রকাশের সম্ভাবনাময় এবং এই দিয়েই গড়ে উঠছে সজলের কবিতার জগৎ।

'এখন ভাবা দরকার লাল জামা। লাল রঙ। আলতা। লিপস্টিক। তরল পায়ের আলতা। আইস্টিক। আরো গভীরভাবে লাল রঙ ভাবা দরকার। রক্ত। পতাকা। ভাবা যাচ্ছে না। কাস্তে হাতুড়ী তারা। ইস্তাহার। সঙ্গ। শুধু লাল। শুধুমাত্র লাল। প্রথম সকালের এবং শেষ বিকেলের সূর্য।'

অন্তর্চেতনার এই স্রোতে লগ্ন হয়ে আছে সজলের অভিজ্ঞতার জগৎ, তাঁর বোধ ও বোধি। প্রতি বাক্য একটি ছবি। একক বিশেষ্য পদেও একটি বাক্য এবং একটি ছবিও। প্রচলিত বাক্যগঠনের যাবতীয় প্রণালী উপেক্ষা করে এই যে বিন্যাস, একে ধরে রেখেছে শব্দসঙ্গের সুরের ঐক্য। ভাষার অন্তর্গত সুরের এই সঙ্গীত আবিষ্কার করেছেন বলেই সজল অনায়াস সরলতায় তাঁর অবচেতন মনটিকে খুলতে খুলতে চলে যান জীবনের প্রবাহে। তাঁর কবিতার শব্দ সঞ্জায় দৃশ্যের যে আভাস ফুটে ওঠে তা হলো মূল উৎসে যাবার উপাদান, সে কারণে তিনি ছবি এঁকে মুছে ফেলেন। এইভাবে ছবি আঁকতে আঁকতে মুছতে মুছতে অহং-এর সীমা পেরিয়ে সজল যে মগ্ন-চৈতন্যের সীমা ছুঁয়ে থাকেন সেখানে 'পাহাড় বন ঝর্ণা জন্ম মৃত্যু' এসব কিছু থাকলেও সেখানে লগ্ন হয়ে থাকে এই অনন্ত বেদনা—'কিছুই দেখা হল না—আমার কিছুই জানা হল না।'

এই অতৃপ্তি শুধু সজলের নয়, তাঁর কবিতার পাঠকেরও।

'নির্বাচিত কবিতা' মহাদিগন্ত, ১৯৯৪) গ্রন্থে সজল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা প্রসঙ্গে উত্তম দাশের এই গদ্য প্রকাশিত হয়। লেখকের অনুমতিক্রমে এই অতিপ্রাসঙ্গিক লেখাটি প্রকাশ করা হল।

ঋজু গদ্য ও জীবনযাপনের আরন্ত অভিজ্ঞতা-য়
সমৃদ্ধ এক অসামান্য উপন্যাস
সুবিমল বসাকের
প্রত্নবীজ
□ হাওয়া ৪৯ প্রকাশনী □

সজল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা বিষয়ক আলোচনা : ২

সজল বায়ে মন আমার

অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রসঙ্গ নির্ণয়

স্মৃতি সতত সুখের এবং বেদনারও। নস্ট্যালজিক এক অনুভব, যা এক্ষুনি আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ৬নং বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীটের সেই বইঘর ওরফে গ্রন্থজগৎ এবং তার অভ্যন্তরে বিছানো বিশাল তক্তপোষ—মাদুর পাতা। দরোজা থেকেই দেবুদা-র (শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়) অলংকরণ পরিপাট্য—মাদুর / বাঁশের টুকরো / পুঁতি দিয়ে সাজানো অসাধারণ সেই বইঘর ওরফে গ্রন্থজগৎ। যার প্রাণপুরুষ আর এক দেব অর্থাৎ দেবকুমার বসু। কাব্যানাটক আন্দোলনের পুরোধা। একশ বছরের নাট্যগৃহ প্রদর্শনীর হোতা আর নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ীর সান্নিধ্য-সভার আয়োজক হিসেবে দেবকুমার-কে বাংলা সংস্কৃতির জগৎ মনে রাখবে। হায়! কালের স্রোতে সেই ৬ নম্বরের ছবি ভেসে গ্যাছে। দেবুদা নেই। গ্রন্থজগৎ নেই। সেই বিখ্যাত তক্তপোষ—যার ওপরে আসীন নাট্যাচার্য শিশিরকুমার স্মৃতিচারণ করতেন। সেক্সপীয়র শোনাতেন / মাইকেল / হয়তো সীতা নাটকে রামের ডায়ালগ—নেই। সময় সমস্ত ছবিটার ওপরে বিস্মৃতির পর্দা ঝুলিয়ে দিয়েছে। আমরা তার সাক্ষী হ'য়ে এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আজো বেঁচে বর্তে আছি। সেই ৬ নম্বরের গ্রন্থজগৎ-এই প্রথম দেখা এবং মনের খাতায় নাম খোদাই—চারু খান / অশোক ভট্টাচায / গণেশ বসু / শক্তি চাটুজ্যে / বিনয় জমুমদার / রামবাবু / সম্রাট সেন / ডাঃ রবি মিত্র এরকম আরো আরো আরো কতজনের এবং হ্যাঁ, অবশ্যই সজল—সজল বন্দ্যোপাধ্যায়—গায়ক / কবি..... .তখন হয়তো সে বিশ বাইশের তরুণ / তরতাজা ক্লোরোফিলে সমৃদ্ধ সকালের রঙীন ফুলের মত—কণ্ঠে তার গান। জর্জ বিশ্বাসের কাছে তালিম নেওয়া বি মেজর থেকে ই শার্পে খেলে যাওয়া গলার সেই গান—এখনো আমায় আচ্ছন্ন করে। আমি বর্তমান ভুলে যাই। খরায় দগ্ধ প্রান্তর পেরুনো 'সজল বায়ে মন আমার' স্নিগ্ধ শীকরে ভিজে ওঠে—আমি শুনি / শুনতে পাই—দিয়ে গেনু বসন্তের এই গানখানি.....আঃ!

প্রসঙ্গের গভীরে

গ্রন্থজগতের ৬ নং বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীটের ঠিকানায় এক দুপুরের আড্ডায় সজলের সঙ্গে প্রথম দেখা—এবং ওর কণ্ঠের সেই গান দিয়ে যার সুরু—দিয়ে

গেনু বসন্তের এই গানখানি...সে তখন বোধহয় ষাট দশকের গোড়া। সঙ্গীত সজলের রক্তে ছিল। ওর বাবা ভাল বাঁশি / ক্লারিওনেট বাজাতেন। গ্রামোফোন রেকর্ড বন্ধও হয়েছিল তাঁর সুরের আয়োজন। সজল তখন থাকত চন্দননগরে—পৈতৃক ভিটেতে। পড়তে এবং স্কুলে চাকরী করার সুবাদে কলকাতায় আসতেই হোত এবং কবিতার সেবক হিসেবে তো বটেই। কবিতার সেবক সজল কিন্তু 'অধিক প্রসবের' বিরুদ্ধে। ষাটের মাঝামাঝি 'শ্রুতি' আন্দোলনে সক্রিয় অংশীদার ছিলো ঠিকই—বেশি লেখেনি তখন—এবং এখনো সজল বহুপ্রসূ নয়। ওর মেজাজে এ ব্যাপারটাই নেই। এই ভাবে তার প্রথম কবিতার বই 'তৃষ্ণা আমার তরী' (১৯৬৬) থেকে 'স্বপ্নে উপকূলে' বেরুতে এগারটা বছর কেটে গেল—অর্থাৎ ১৯৭৭। 'পিকাসোর নীল জামা' ১৯৭৯। 'মিড়' ১৯৮১, 'ব্রায়ার পাইপ'-১৯৮৪। 'ভ্রমণ'-১৯৮৬। এর আটবছর পরে, ১৯৯৪-এ প্রকাশ পেল 'নির্বাচিত কবিতা'। এই নির্দেশিকা সজলের 'অধিক লেখার বিরুদ্ধে' মনোভাবটিই প্রমাণ করে।

আলাপচারিতায় সজল যেমন তুখোড়—তার ছোট ছোট তীর্যক অমোঘ বাক্য প্রয়োগে / কবিতায় 'তৃষ্ণা আমার তরীর' পরবর্তী সময় থেকে কবিতাতেও সজল আশ্রয় করেছে কথোপকথনের ভঙ্গী / মেদবর্জিত ঋজু যার শরীর—অথচ জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। নিজস্ব একটা ফিলসফিও প্রতিষ্ঠিত সেই সব সংহত কবিতার ছবিতে—যা ভাষার অন্তর্গত আবিষ্কার—সজলের নিজস্ব ঘরানা। সজলের বাহ্যিক অহং কখন যে তার চৈতন্যে বিলীন হয়ে যায়! মগ্ন থেকে নিমগ্নতার গভীরে সে হারিয়ে যায়! সজল জানে / অথবা জানে না এই গূঢ় প্রক্রিয়া—তা জানার প্রয়োজন আমাদের নেই—কারণ আমরা তার কবিতার কণ্ঠে তো শুনেইছি—'কিছুই দেখা হল না—আমার কিছুই জানা হল না।' আভাসে দিগন্ত উদ্ঘাটনই সজলের কবিতা—গোখুরের জলবিম্বে সমুদ্র দর্শনই সজলের কবিতা...

'সারাদিন
এস্রাজ বাঁধা—
সারারাত
তার ছিঁড়ে ফেলা'

অথবা

'ঘুমের মধ্যে
শুধু রক্তপাত
ভয়ে ভয়ে
হেঁটে চলা'

(১৯৮১-র মিড়)

১৯৮৬-র 'ভ্রমণে'র কবিতা এমন যা নিছক গদ্যও হতে পারত। হয়নি তার কারণ নিচের উদ্ধৃতিতেই ধরা ঃ

জালেঘেরা গাড়ীটা রোজ মাঝরাতে বাড়ি পৌঁছে দেয়। কে চালিয়ে আনে জানি না। কোথা থেকে আসে—জানি না! কে দরজা খুলে দেয়—জানি না। ভেতরে ঢুকে পড়ি। গাড়িটা চলতে থাকে।

চারপাশে বারুদের গন্ধ শোনা যায়। কোথাও মা। কোথাও বউ। কোথাও বন্ধু। এবং চোখ থেকে ফিনকি দিয়ে দীর্ঘশ্বাস। গাড়িটা চলতে থাকে। তারপর একটা বাড়ির সামনে এসে থামে।

এ বাড়িতে আসার কোন রাস্তা নেই। তবুও গাড়িটা বাড়ি পর্যন্ত আসে। কে দরজা খুলে দেয়, আমায় নামিয়ে দেয়—জানি না। আমি নেমে আসি।

জানি চাবি দিয়ে বাড়ির দরজা খোলে না। ঠোঁট ছুঁইয়ে তালা খুলি। বাড়িটার একটা ঘরে সারাক্ষণ টাইপরাইটারের খুটখাট। একটা ঘরে চৌদুনে সেতার। একটা ঘরে তামাকের কুঁচি আর দীর্ঘশ্বাস। একটা ঘরে বিছানায় বরফ। একটা ঘরে একটা বেড়াল নিশ্চিন্তে থাবা চাটে। সামনে অনেক কাঁটা পড়ে থাকে।.....

.....রাস্তা না থাকলেও গাড়ি চলছে। রাস্তা শেষ না হওয়ার হলেও গাড়ি চলছে। রাস্তা শেষ হলেও গাড়ী চলছে!.....

...রোজ এমনি করেই রোজ এমনি করেই রোজ এমনি করেই রাত বাড়ছে।

সজলের কথনভঙ্গী এখানে এতই লিরিকাল এতই গভীর ভাবনার অভিসারী যে নিছক গদ্যের আবরণে এটি আদ্যন্ত কবিতাই। নিজস্ব সজলের এই নিজস্ব স্টাইল। ১৯৮৪-র 'ব্রায়ার পাইপ' যেন সজল নিজেই সটান এসে দাঁড়িয়েছে অক্ষর ধরে ধরে ঃ

'ওই যে হাত দেবার জন্যে নির্সাপস করলেই
তেলোয় তুলে ধরেই
আর সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁটের ইচ্ছে—
দু দাঁতের ফাঁকে কামড়ে ধরতেই—
লিপস্টিকের গন্ধটা পেলে কি ভালোই হত—' (ব্রায়ার পাইপ)

অথবা

'কারা নিঃশ্বাস ফেলছিল আর হিমঘরের মধ্যে কারা আমায়
ঠেলে দিচ্ছিল। জিভে বরফ। বলতে গেলেই দেয়ালে ধাক্কা শব্দ প্রতিশব্দ
তখন বৃষ্টি। তখন ঝড়। তখন ফুলের গন্ধ। তখন সেই হিমঘর আর
তখন সেই নিঃশ্বাস...' (নৈঃশব্দ্য)

কবির শব্দে নিবদ্ধ নিঃশ্বাস...জিভে বরফ...বৃষ্টি...ঝড়...ফুলের গন্ধ...সব সবই যেন আমাদের ঘিরে...আমাদের ছুঁয়ে। তাই কবিতার ভাষা আর শুধু কবিতা থাকে না / জীবন হয়ে ওঠে। মিডিয়ার দিকে পেছন ফিরেও সজল নিজের মত হাঁটতে জানে। নিজের জগৎ গড়তে জানে এবং ভাঙতেও সে কম দক্ষ নয়। সজল বেঁচে আছে তার মত করে—তার নিজস্ব পৃথিবীতে কেউ পছন্দ করুক আর না করুক। আমি—মনুমেণ্ট এবং কফি হাউস থেকে ঢাউস দূরত্বে দাঁড়িয়ে এই ভাঙা / না ভাঙার নির্মাণ দেখতে পাই—দেখছি সেই কবে থেকে। সজল কে / একজন কবিকে / একজন মানুষকে। আনন্দ দা'র 'সমকালীনে'—সজলকৃত আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ—'সোনালি ডানার চিল'-এর সমালোচনা / গ্রন্থজগতের আড্ডা সেই ঘাটের সুরুতে / পরে গলফ্‌গ্রীণে ওর বাড়িতে / কেদার দা (ভাদুড়ী)-র বাড়িতে দুপুরে অথবা রাতে মদ্যপান-ভোজনের আসরে ভিজিয়ে দেওয়া সময় কি ভাবে বয়ে গ্যাছে / তার খোঁজ পাঁজরের নিচে যে যাদুঘর—সেই যাদুঘরের দেয়ালে আছে মুরাল হয়ে।

অন্তিম বয়ান

অগ্নি দগ্ধ বইমেলায় যখন সজল-কেও দেখলাম একখণ্ড দগ্ধ মেঘের মত, একটু নুয়ে পড়া / ভেঙে পড়া খেলোয়াড়ের মত / তখন খুব খারাপ লেগেছিল / ভেবেছিলাম এমন হবার মানুষ সজল নয়—তবে কি ওর সেই অমোঘ সত্য উচ্চারণ— 'কিছুই দেখা হল না আমার / কিছুই জানা হল না'—ওকে আচ্ছন্ন করেছে—এই সাতানব্বুই এর শীতে.....। মেঘমুক্ত সজলকে আবার যখন দেখলাম কেদার দার গাঙ্গুলী বাগানের ফ্লাটে—তখন সে গানের সুরে নিমগ্ন এক বিদগ্ধ সতেজ মানুষ। এত...এত ভাল লাগল...তারপরে আবার উত্তমের মহাদিগন্তে—সকালবেলার আলোতে উজ্জ্বল সজল-কে—খুব ভাল লাগল। মনে মনে তখনই লিখলাম –প্রিয় সজল, যখন চলে যাব রবীনের কাছে—তখন যেন বলতে পারি—শোন্ রবীন—সজল বায়ে মন আমার স্নিগ্ধ শীকরে ভিজে আছে রে...সজল তেমনি উচ্ছল আছে...এখনো ওর

সারাদিন
এস্রাজবাঁধা
সারারাত
তার ছিঁড়ে ফেলা...এখনো..
ইতি / অরুণ

□□□

কালীপ্রসাদ রিজাল

আত্মজের প্রতি

আজ বড় বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে প্রণয়ের ঝড়
জেগে উঠেছে দরিদ্র হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষা—ভয়ঙ্কর ভাবে—
মাকড়শার ফাঁকা জালে বিজ বিজ করে ওঠে—মৃত্যুকীট
ফাঁকা জালের উত্তরাধিকারী মৃত্যুর শূন্যতায়—
কুঁকড়ে রয়েছে শিশু
হাত-পা ছুঁড়ে কাঁদে সে এই প্রথমবার
তারপর ক্রমাগত কাঁদে...কাঁদতে থাকে...কাঁদতে থাকে
হায়, কি অসহায়, নিরুপায় আমার সন্তান
নিঃসহায়, নিরাশ্রিত
আমার সন্তান
আপন মায়ের রক্ত পান ক'রে সে
আমার মগজ খারাপ ক'রে দেয় সে

কঙ্কালসার পাঁজর নিয়ে
ভেঙে পড়া ঘাড় সোজা করে
রুগ্ন হাত
হলুদ দাঁত
কোটরবদ্ধ চোখ ও নীল ঠোঁট নিয়ে
আমারই দুর্গন্ধিত যকৃতের সন্তান বেড়ে চলেছে
আমারই বিরুদ্ধে
ফরিয়াদী চিঠির মত পাপ তেতে উঠেছে ক্রমশঃ
আমি নিজেই দেখছি আমার অপরাধ
অনন্যোপায় অভিযুক্ত হয়ে ফিরে আসে।

পিতা সংসার গড়ে দেয় সন্তানকে
ক্ষেত, ঘর, বাগান, গোহাল—
টাকা-পয়সা, সোনা-দানা জমা ক'রে রাখে
বারোমেসে আমদানির ব্যবস্থা করে

একটা চাতাল-ছায়ার বর্তমান ছড়িয়ে দেয়
সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ

আমিও আমার সন্তানকে অসম্ভব ভালবেসেছি
নিরিবিলিতে নিয়ে গিয়ে ওর গলা টিপে ধরিনি
আমি গরীব, তবুও সন্তানকে অপত্য স্নেহ দিয়েছি
জন্ম-নাড়ি-সহ হিম-গিরিতে ছুঁড়ে ফেলিনি
দাসত্ব ও নালিশ এড়িয়ে আমি
জড়ো করেছি পরিশোধহীন ঋণ !
ক্ষুধার্ত, উলঙ্গ, হোঁচট খাওয়া সন্তানের প্রতিরোধের জন্য
এক বিশাল ভারি রুক্ষকাঠ আমি কাঁধে তুলে নিয়েছি
কোন প্রতিভা নেই আমার সন্তানের
জানেও না সে কিছু, পড়েও নি সে, গোনেও নি কিছুই
আমার সন্তান শুধু অনাথ-ই নয়, সে নিঃসঙ্গ, খাপছাড়া
তেল-মারার কায়দাটুকুও রপ্ত করতে পারেনি

উত্তরাধিকারী সূত্রে আমার সন্তান পেয়েছে
দুঃখ, যন্ত্রনা ও অশ্রু
উত্তরাধীকারী সূত্রে আমার সন্তান পেয়েছে
দারিদ্র্য, অসম্মান, গ্লানি
আমার সন্তানকে সহ্য করতে হবে আপমান, অবহেলা, উপেক্ষা
নিজেকে ধিক্কার জানাবে
অভিশাপ কুড়োবে
থুতু ছেটাবে
আমার সন্তান সর্বদা হীনমন্যতায় নুয়ে থাকে
আমার সন্তান সর্বদা দীনমন্যতায় ডুবে থাকবে
আমার সন্তান—বস্তুতঃ আমারই সংস্করণ
আমারই গোয়ার্তুমি ও জেদ,
আমার অতৃপ্ত আশা-আকাঙ্খা, ইচ্ছে ও স্বপ্ন নিয়ে
আমিই হাজির হই শুধু নাম পাল্টে
আমার হাসি, সুখ আর তৃপ্তি খুঁজতে
বার বার ছুটে আসি আমিই—
অথচ, এই ভেবে আমার বুকের ভেতর জ্বলতে-পুড়তে থাকে
আমার সন্তান ও মারা যাবে ছটফট করে—আমারই মত
অতৃপ্তি, হতাশা ও অসাফল্য নিয়ে—
ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও আকাঙ্খা নিয়ে—

শোনো—আমার সন্তান বিপ্লব করতে পারবে না
আমার সন্তান বিদ্রোহ করতে পারবে না
আমার সন্তান ক্ষুধার্ত—
আমার সন্তান কিছু করতে পারবে না
আমার হা-ঘরে সন্তান কোন দাগ না কেটেই মারা যাবে
মহান হবার যোগ্যতা আমার সন্তানের মাঝে নেই

মিথ্যে সম্ভাবনার জলজ্যান্ত প্রমাণ—আমার সন্তান
মিথ্যে আশার জলজ্যান্ত উদাহরণ—আমার সন্তান
আমার সন্তান জানেনা অপরাধ করার কুট-কৌশল
সরকারী রেশন থেকে বঞ্চিত বেচারা
বেইমানের সঙ্গে বেইমানী করার বেসাতিত্ত রপ্ত করেনি
বোবা, নির্বোধ, গরুর মত আকাট আমার সন্তান
জানেনা প্রমাণ জুটিয়ে কি ভাবে বয়ান দাখিল করতে হয়
সততার বদলে আমার সন্তান পড়ে-পড়ে মার খাবে
এবং ইমানদারির সঙ্গে মাটিতে মিশে যাবে।

আমারই সন্তান
সে নিজে গুলি খেয়ে অপরকে নেতা তৈরী করে
সে মালপত্তর ঘাড়ে বয়ে
অন্যদের এভারেস্ট বিজয়ী করে
আমারই সন্তান
তার রক্তে ইতিহাসে লিখিত হয় অপরের নাম
তার ঘামে বিচ্ছুরিত হয় অন্যান্যদের কাজের ফিরিস্তি
অলিখিত কবিতা ও বোধ—আমারই সন্তানের—
অদেখা আবিষ্কার ও চিন্তাভাবনা—আমারই সন্তানের

আমার সন্তানের প্রতিভা ও উৎকর্ষতা
ছাই হয়ে আছে
আমার সন্তানের যাবতীয় সম্ভাবনা
অসম্ভব করে তুলেছি আমি।

ইতিহাসে সেইসব অপ্রকাশ্য চরিত্র
আমারই সন্তানের
'আমি ছিলাম'—এটা বলার জন্য।
আমার সন্তান পৃথিবীর ভার
সে নাকি জটিল করে তুলেছে প্রগতি ও পরিকল্পনা।

সে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে ঘাম ঝরায়
আধপেটা খায়, সমস্যার জন্ম দেয়
দেখে মনে হয়, ভ্রূণাবস্থায় তাকে খুন করে ফেলাটাই
হতো বুদ্ধিমানের কাজ
হায়, গর্ভপাত যদি আইনতঃ সিদ্ধ হতো !

জীবনে প্রবেশ-পত্র থেকে বঞ্চিত
আমার সন্তান
আজীবন ভয়ে-ভয়ে বেঁচে থাকবে, আহ্ !

কতই না উপেক্ষিত তার ইচ্ছা আকাঙ্খা,
অশ্রু-কান্না
কি বিরক্তিকর তার এই বেঁচে থাকা।

নির্ভীক সাংবাদিক ও গদ্যকার
অজিত রায়ের দুটি জৈবনিক উপন্যাস
দোগ্‌লাচরিত
এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না

কবিতা না কবিতা—উত্তর লিবিডো
শুভঙ্কর দাশ-এর কাব্যগ্রন্থ
প্লেলের হাড়গোড়
□ গ্রাফিতি □

'মানুষের তৈরী চার্চের আমি ধার ধারিনে। আমি আমার স্রষ্টার কাছে ফিরে যাচ্ছি। তিনিই আমাকে তাঁর সর্বোত্তম বিশ্রাম-স্থলে লুকিয়ে রাখবেন। আপনারা যেখানে খুশি আমাকে সমাধিস্থ করতে পারেন—তা আপনাদের দরজার সামনে অথবা কোন গাছ তলায়। আমার কঙ্কালগুলোর শান্তি কেউ যেন ভঙ্গ না-করে। আমার কবরের ওপর যেন গজিয়ে ওঠে সবুজ ঘাস।'

'কিন্তু এ হলো সেই ছুরি যা স্বপ্ন সাম্রাজ্যের ঠিক মাঝ পথে গিয়ে থেমে থাকে। আমি তাকে ধরে রাখি আমার মধ্যে সেই খাঁড়ি প্রান্তে, যার ওপরে রয়েছে আমার নির্মেঘ চেতনা-প্রান্তর।'

আমার শুধু ভয় একটি, এ-দেশে তথা বিদেশে ক্লাসিকসের সম্মান ক্রমেই কমে যাচ্ছে। মানুষ মনোরঞ্জক দিকটাই দেখছে বেশী; ক্লাসিকসের স্থায়ী গভীর সচ্চিদানন্দ রস তারা পরিশ্রম করে আস্বাদ করতে চায় না অথচ রবীন্দ্রনাথের মূল উৎস সেইখানেই।

প্রকাশক ঃ
দেবযানী মুখোপাধ্যায়
'জয়া'
২৬২ডি/১ বাঙ্গুর এ্যাভিনিউ
ব্লক-এ, কলকাতা-৭০০ ০৫৫

মুদ্রণ ঃ
মিন্টু প্রিন্টার্স
১১২ রাজা রামমোহন সরনী
কলকাতা ৭০০ ০০৯